দিয়ে পেছেনে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিকেও জীবন থেকে প্রায় নিভে যেতে চলেছে

International Peer Review Journal
ISSN 2321-7340(Print) & E-Journal Virson

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

(The Source of Folk)
E-Journal Virson
Vol.-1: Issue-1: 2022

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

উপ্‌জনভুই পাবলিশার্স
মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার শিক্ষা ভাবনা

অরবিন্দ ডাকুয়া

রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা স্বাধীন রাজ্য কোচবিহারে জন্মগ্রহন করেছিলেন ১২৭১ বঙ্গাব্দে মাথাভাঙ্গা মহকুমার খলিসামারী নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে। যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহন করেছেন সে সময় মাথাভাঙ্গা মহকুমার রাস্তাঘাট বলতে কিছু ছিল না। ছিল নদী জল আর জঙ্গল। এরকম একটা গ্রাম থেকে উঠে এসে তিনি নিজের কর্মদক্ষতায় রাজবংশী জাতির জনক বলে উত্তর পূর্ব ভারতে পরিচিতি লাভ করেছেন। যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহন করেছিলেন সে সময়ে ভারতবর্ষে বহু সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারকের জন্ম হয়েছিল। যেমন জ্যোতিরাও ফুলে, দয়ানন্দ সরস্বতী, বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন আরও আনেকে। সমাজ সংস্কারকেরা ধর্মীয় সংস্কারের ওপর জোর দিতে গিয়ে অনেকে হারিয়ে গেছেন। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়। স্কুল, কলেজ তিনি অনেকগুলো স্থাপন করেছিলেন - বিদ্যাদান করে বিদ্যাসাগরও হয়েছিলেন কিন্তু যখনই বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে গেলেন সমাজ তা ভালভাবে মেনে নেয় নি বলেই পরবর্তী কালে অশেষ দূরবস্থার মধ্যে পরতে হয়েছিল। রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলনের প্রকৃতি ও প্রেরনার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলনের প্রকৃতি ও প্রেরণার মধ্যে সংক্ষিপ্ত তুলনা মূলক বিচারের মধ্যে। এই দুই মনীষী সমকালীন সমকালবর্তীও নন এবং তাঁদের সংস্কার আন্দোলনের বিষয় ও পরিপ্রেক্ষিতও এক নয়। এই আপাত বৈপরীত্যতার প্রেক্ষাপটে রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার সংস্কার আন্দোলনের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য এই তুলনা।

ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজ সংস্কারের প্রেরণা এসেছে সমাজের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং করুণা থেকে। বিদ্যাসাগর জননী ভাগবতী দেবী ছিলেন এই প্রেরণার আর একটি উৎস। গ্রামের বাল-বিধবাদের দুঃখ তাকে বিচলিত করেছিল। তিনি তাদের দুঃখ দূর করতে চেয়েছিলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা বলেছিলেন। জননীর এই ইচ্ছাকে অঙ্গীকার করে মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর বাল-বিধবাদের দুঃখ দূর করার লক্ষে তাদের পুর্নবিবাহের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। বলা যেতে পারে করুণার আদ্র হৃদয় ছিল এই আন্দোলনের মূল প্রেরণা এবং পরিচালিকা শক্তি। পঞ্চানন বর্মার ক্ষেত্রে এই উৎস ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র। অভিভক্ত উত্তরবঙ্গের এবং নিম্ন অসমের অধিবাসী রাজবংশী জনগোষ্ঠী অশিক্ষা এবং দারিদ্র তাঁর হৃদয়কে বিচলিত করেছে। কিন্তু অশিক্ষা এবং দারিদ্র মুক্ত রাজবংশী সমাজ নির্মানের স্বপ্ন পরিকল্পনা এবং নির্দ্দেশ আসে মূলত তাঁর মস্তিস্ক থেকে। ছাত্র জীবন এবং পরবর্তী কালে

কর্মজীবনে আইনজীবী হিসেবে রংপুর আদালতের কোন কোন ঘটনা তাঁর উদ্দিপন বিভাগের কাজ করেছিল। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের নির্ণায়কের ভূমিকা নিয়েছিল। এ সবের উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি। কারণ একটাই। এই ঘটনাগুলি পঞ্চানন বর্মার বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে, সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রে বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সব ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় পঞ্চানন বর্মা নিশ্চয়ই ব্যথিত বিচলিত এবং আহত হয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে যা হয়, পঞ্চানন বর্মা যদি তাই হতেন অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি তিনি এই সব ঘটনার কথা বিস্মৃত হয়ে অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যেতেন তা হলে এই বিস্তৃত ভূভাগের অধিকারী এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। কিন্তু তা হয়নি। কারণ পঞ্চানন বর্মা এই জনগোষ্ঠীর সমস্যা অনুভব করেছেন হৃদয় দিয়ে এবং তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছেন মস্তিস্ক দিয়ে। আবেগ, বুদ্ধি, হৃদয় এবং মস্তিস্কের এই আশ্চর্য সমাহার পঞ্চানন বর্মার মধ্যে ঘটেছিল বলেই তিনি সমকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘটনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপলব্ধিতে পৌছতে পেরেছিলেন যে একটি পরাধীন দেশের অধিবাসী জনগোষ্ঠীকে যদি ঐক্যবদ্ধ করতে হয় তা হলে সেই জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার। তিনি যখন ১৯০১ সালে নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী রাজ্য রংপুরে আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে যান, তখন তিনি দেখতে পেলেন রাজবংশী সমাজ শিক্ষায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। সাধারণের লেখা পড়ার কোন চেষ্টা বা বিন্দু মাত্র উৎসাহ ছিল না। গ্রামে গ্রামে যে পাঠশালা আছে তাতে বাংলা শেখাবার মোটামুটি ভাল ব্যবস্থা বর্তমান। রায়সাহেব নিজে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কেবল দেশীয় রক্ষণশীলতা নিয়ে থাকলে চলবে না এর বাঁধন কিছুটা আলগা করে দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাবের স্রোতের মধ্যে আনতে হবে। নতুন ভাবে দেশ এবং সমাজকে গঠন করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে উন্নততর জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই সমাজ বা জাতি টিকে থাকতে পারবে না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উপনিবেশিক সরকার পূর্ব ভারতের আধিবাসিদের সম্মন্ধে নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহের জন্য মনযোগী হলেন। ঐ সময় পূর্বভারত থেকে উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের সমাজ এবং সামাজিক অবস্থান কি ছিল তা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Walter Hamilton-এর লেখা The best India gazetter voll-II -এর দ্বিতীয় খন্ডে তিনি লিখেছেন 'In Rangpur it is highly concidered in proper least.....any education on women and no man will marry a girl who is known to be capable of reading girl of rank were unusually married girl of rank were married at eight years of Age.' রংপুরে লেখাপড়া শেখানোকে অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করা হত, পড়তে জানে একথা জানতে পারলে কোন লোক মেয়েকে বিয়ে করতো না। সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের আট দশ বছরেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত।

রংপুরের উত্তরে সামন্ত রাজ্য কোচবিহার। এখানকার অবস্থা আরও খারাপ ১৮৮২-১৮৮৩ সালে G.T.B. Dalton ছিলেন কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনার। তিনি শিক্ষা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট লিখেছেন, 'We (the British) took charge of the affairs in 1864 there were only two Schools receiving state Support. No elementary Schools aided or unaided are returned, of course some meano of obtaining intructions existed wherever there were well-to-do Jotdars who could afford to entertain a Sirkar or script to keep their accounts and look after their children. This Sircar tought the children of their employers and probably other children as well; something of the nature of pathsalas therefore existed.'

১৮৭২ সালে এ জেলায় প্রথম সেনসাস করা হয়। তখন এই জেলায় মাত্র ১৯ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২৪৪ জন ছাত্র ছিল। শিক্ষক সংখ্যা ২২ জন মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন ইংরেজ সরকার তথ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করেন তখন উত্তর বঙ্গের তিনটি জেলায় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পঞ্চানন সরকারের শিক্ষা সম্পর্কে কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না, এমন কি তিনি নিজেও এ ব্যপারে কোথাও উল্লেখ করেন নি। যাহোক খুব সম্ভবত তিনি পিতার কাছ থেকেই হাতেখড়ি নিয়েছিলেন। পাঠশালার শিক্ষা শেষে বিদ্যোৎসাহী পিতা তাঁকে গ্রাম খলিসামারী থেকে ৬ মাইল দূরে মাথাভাঙ্গা শহরে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন। পঞ্চাননের মধ্য ইংরেজী শিক্ষার বিষয় ১৮৮৫-৫৬ সালের কোচবিহার গেজেটে পাওয়া যায় 'Panchanan Sircar, a native of Cooch Behar, who passed the M.E. Examination in the First division from Mathabhanga School succeed to secure the first division.' এখানে তদানিন্তন সময়ে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর ও মালদহ প্রভৃতি জেলা রাজসাহী বিভাগের অধীন। শুধু দেশীয় রাজ্য কোচবিহারেই নয়; সমগ্র বাংলার উত্তরাংশের প্রায় ২৩ লক্ষ রাজবংশী ভূমিপুত্রেরা অধিকাংশই বাস করতেন গ্রামাঞ্চলে। স্বাভাবিক ভাবে, এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সে কারণেই রাজবংশী প্রান্তিকেরা অনগ্রসর ছিলেন স্বাভাবিক নিয়মে। সর্বপরি দেশীয় রাজ্যে চাকরির ক্ষেত্রেও তারা ছিলেন ব্রাত্য। কারণ রাজ্য শাসন করার জন্য দক্ষিণ বঙ্গ থেকে যে সমস্ত কর্মচারীকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই উচ্চবর্গীয়। এই উচ্চবর্গীয় মানুষের কাছে তারা সব সময়েই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার হতেন। সাধারণ লোকেরাও অপমানিত হতো এমন কি উচ্চশিক্ষিত পঞ্চানন সরকারও

এর থেকে বাদ যান নি। তখনও তিনি রংপুরে ওকালতি শুরু করেন নি। কোচবিহারের মূল বোর্ডিং এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর পদে চাকুরিতে নিযুক্ত থাকাকালীন একদিন District Inspector of School-এর সঙ্গে হাতিতে চড়ে মাথাভাঙ্গার পার্শ্ববর্তী কোন বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য যাচ্ছিলেন এবং যাত্রা পথে স্থানীয় এক গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হলে পঞ্চানন সরকার রাজবংশী ভাষায় কথা বলেন। এই অতি সামান্য ঘটনার জন্য D.I.S কোচবিহার স্টেট কাউন্সিলে রিপোর্ট করে বলেন যে তাঁর সরকারী চাকুরী করার কোন যোগ্যতাই নেই। এই ঘটনার পর রায়সাহেব পদত্যাগ করেন।২

১৯০১ সালে কোচবিহার পরিত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী রাজ্য রংপুরে চলে আসেন এবং রংপুর জজ কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। কিন্তু এখানেও সেই উচ্চবর্ণ এবং নিম্ন বর্ণের বিভেদ দেখে তিনি সতীর্থ মি: মৈত্র-এর কাছ থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন আর এই আঘাতেই তিনি নিশানা খুঁজে পেলেন। তিনি স্থির করে ফেলেন যে ভাবেই হউক জাতির উন্নতি করতে হবে এবং প্রয়োজন বোধে ওকালতি ছেড়ে দেবেন। এর পর আর একটি ঘটনায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। রংপুর নর্মাল স্কুল ছাত্রাবাসে কয়েক জন রাজবংশী ছাত্র থাকত। একদিন একটি ছাত্র রান্নাঘরে গিয়ে পাচককে রান্না হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে, 'রান্না হয়েছে কিনা ?' অমনি ২/৩ টি ছাত্র বলে উঠল 'আমরা এ রান্না খাবনা।' রান্না করা জিনিস পত্র ফেলে দেওয়া হয়। ছাত্ররা পঞ্চাননকে সমস্ত ঘটনাবলী জানান।

রংপুর শহরে অনেক রাজবংশী ছাত্র শিক্ষার জন্য থাকত। কিন্তু ছাত্রদের থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না যার ফলে অনেক সময় দেখা যেত ছাত্ররা পড়াশুনা বাদ দিয়ে চলে যেত। পঞ্চানন বর্মা উচ্চশিক্ষার একটি বিশেষ অসুবিধা দেখে তা দূর করার জন্য একটি ক্ষত্রিয় ছাত্রাবাস তৈরী করার মনস্থ করেন।৩ তদানিন্তন সরকারের কাছে সমাজে শিক্ষার অভাব এবং ছাত্রদের শহরে থেকে লেখাপড়া শেখার অসুবিধার কথা জানিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই আবেদনে সরকার স্বীকার করেন যে ক্ষত্রিয় সমিতি থেকে আংশিক পাঁচ হাজার টাকা দিলে সরকারের পক্ষ থেকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। অতএব পঞ্চানন বর্মা ১৩১৮ সালে রংপুরে ছাত্রাবাস নির্মানের জন্য চাঁদা আদায় শুরু করেন। কিছু দিনের মধ্যে ৪৯০০=০০ টাকা সংগ্রহ করে সরকারের হাতে দিয়েছেন। সরকার ৯৮০০=০০টাকা প্রদান করতে স্বীকৃত হন। ১৩২০ সালে রংপুর সহরে ৩২ জন ছাত্র থাকার উপযুক্ত করে ক্ষাত্র ছাত্রাবাসটি তৈরী হয়।

রায় সাহেব নিজে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি বুঝেছিলেন কেবল দেশীয় রক্ষণশীলতার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। এই ধারণার পরিবর্তন করে পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকেও ঝোক বাড়াতে হবে। আমরা রবীন্দ্র নাথের কথা সাহিত্যে দারিদ্র বুভুক্ষতা, যৌনতা, অপরাধ প্রবণতা, সমাজের পিছিয়ে পরা বর্গের মানুষের জীবন ইত্যাদি সাধারণ ভাবে অনপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার (১৯১৩) পেলেন, ঠিক সময় বাংলা সাহিত্যে এলন শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক অনুসাসন সর্ম্পকে একটা আলাদা মানসিকতা নিয়ে। শরৎ চন্দ্র রবীন্দ্র নাথের তুনায় নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের অর্থনৈতিক সঙ্কটকে উপন্যাসে অনেক বেশী স্থান দিয়েছেন। জীবন যাপনের ভীত যে প্রধানত: অর্থনীতি-এই সত্যটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় তার কথা সাহিত্যে শরৎ চন্দ্র তার সমকালের বাঙালী মধ্যবিত্তদের সমাজ ধারণা, নৈতিকথার আদর্শ আর রুচি অনেকটা মেনে চলেছিলেন নিজের লেখায়। তার উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের প্রগতিমুখিন জীবন ধারণার আর একটি প্রধান তাঁর কোন কোন উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। তিনি মানুষের জাত-ধর্ম-বর্ণেরতথাকথিত উচ্চতার দাপটে নয়, জমিদারি বা পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সম্পত্তির জোরে নয় নিজস্ব অর্জিত মেধার ভিত্তিতে সমাজকে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেছেন তার পন্ডিত মশাই, বামুনের মেয়ে ইত্যাদি। ১৩১৭ সালে ১৮ই বৈশাখ রংপুর শহরে যে ক্ষত্রিয় সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়েছিল তা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশনে রায় সাহেবের শিক্ষা বিষয়ক বক্তব্য। সমগ্র কোচবিহার তথা পার্শ্ববর্তী অসম অংশের রাজবংশী সমাজে শিক্ষা অগ্রগতি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই অধিবেশনে তিনি বলেন, 'বিদ্যা শিক্ষাই জাতির উন্নতির মূল'। শিক্ষার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গিকে কখনই সঙ্কীর্ণভাবে না দেখে ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ ব্যাক্তি কল্যান ও সমাজ কল্যানের মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষা যে প্রয়োজনীয় তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সারা জীবন শিক্ষার প্রসারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। পঞ্চানন বর্মা তার কর্মযজ্ঞ খুঁজে পেয়েছিলেন প্রাণের তারনায় নয় - মনের কৌশলেও নয়, আত্মার প্রেরণায়। স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমর আহ্বানই তাঁর হৃদয়কে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করেছিল। সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম, কুপ্রথাদুষ্ট ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন সমাজ সংস্কারে তিনি সন্ন্যাসীর বাণী মর্মে গেঁথে নিয়ে নিষ্ঠা, প্রেম, সহানুভূতি ও বৈরাগ্যের মূর্তিমান বিগ্রহ হয়ে উঠেছিলেন। বিশ শতকের বাংলায় ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার প্রত্যেকটির সূচনা হয়েছিল কলকাতা কেন্দ্রীক। আর এখানেই পঞ্চানন বর্মা ছিলেন ব্যতিক্রমী। সুজলা, সুফলা এই বরেন্দ্র ভূমি থেকেই তিনি বুদ্ধিবাদী ও নানা সংস্কার আন্দোলন ও শুদ্ধ সাধন করে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির সমাজ জীবনে গ্লানি ও অবক্ষয় রোধ করেছিলেন। রায় সাহেব বলেছেন, 'আমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের জন্য শিক্ষা

আবশ্যক। এই শিক্ষাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ধর্ম চর্চা, সদগুন চর্চা ও ধনাগম চর্চা। ধর্মহীন শিক্ষার কুফল সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ধর্ম আমাদের ক্ষণ বিকাশ জীবনকে বাড়াইয়া দুইদিকে অন্তরের সহিত সংযোগ করতঃ মহান করিয়া তোলে। ইহ জীবনের ক্ষণিকতা ও পরজীবনের গৌরব দেখাইয়া জীবনের চরম উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেয়।'

'আমরা এখন সকলের হেয় হইয়া পড়িয়াছি। ইহার প্রধান কারণ আমাদিগের শিক্ষার অভাব। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব আমরা আমাদের ভালমন্দ সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পরের কথায় পরিচালিত হইয়া থাকি। আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের যাহা ভাল আছে কি পূর্বে ভালছিল, অপরেরা তাহাদের নিজেদের রুচি বা স্বার্থ অনুসারে ভাল বা মন্দ বলিয়া বর্ণনা করিতেছি। অজ্ঞতাবশতঃ আমরা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহন করিতেছি। অর্থাৎ শিক্ষার অভাবেই আমরা আমাদের বিচার ও যুক্তি হারাইয়াছি। পরের তিরস্কারের ভাজন হইয়াছি। সুতরাং অপরে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেছি। আমরা তাহার প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইতেছি না। সন্মান চাহিতেছি, কিন্তু পাইতেছি না। কারণ আমরা সন্মান লইতে অক্ষম। বিদ্যাশিক্ষা না করিলে সদ্‌গুণ লাভ করিতেও সন্মান পাইতে সক্ষম হইব না বিদ্যাশিক্ষার অভাবে অর্থপার্জন ও অর্থরক্ষা আমাদের অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আমরা সকলে কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করিয়া থাকি, আমাদের মধ্যে নিস্ব ..... লোক নাই বলিলেও চলে। কিন্তু প্রকৃত ধনশালী লোকও আমাদের মধ্যে নাই। যাঁহারা হয়তো কঠোর পরিশ্রম করিয়া কিছু উপার্জন করিয়াছেন তাঁহারাও শিক্ষার অভাবে তাহার উপযুক্ত পরিচালনা, সদ্ব্যবহার ও অধিকদিন সংরক্ষণ করিতে পারিতেছেন না। যদি অর্জনকারী ব্যক্তি কোনরূপে তাহা সংরক্ষণ করিতেছেন, তাহার শিক্ষাহীন উত্তরাধিকারীর হস্তে তাহার বহু কষ্টের ধন বিনষ্ট হইতেছে। এইরূপে তাহার ধন বেশীদিন থাকিতে পারিতেছে না। ধনের অভাবে সন্মান রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না। অর্থে ..... জন্য আমাদের বিদ্যাশিক্ষার কর্ত্তব্য। কৃষি আমাদিগকে পালন করিতেছে, কৃষি আমরা ছাড়িব না। কিন্তু অন্য ব্যবসা দ্বারা ধনাগমের পন্থা সুগম করাও আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু শিক্ষার অভাবে সামর্থহীন আমরা ধনাগমের সেইপথ অবলম্বন করিতে পারিতেছি না। অল্পশ্রমে কিরূপে অধিক ফল হয়, অল্প ব্যয়ে কিরূপ আর্থিক লাভ হয়, আমরা বিদ্যাশিক্ষার অভাবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমাদের ধনাগমের পথ সুতরাং রুদ্ধ। ধনাগম পথ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ধনসঞ্চয়ও অসম্ভব। (বৃত্তবিবরণী প্রথম বর্ষ পৃষ্ঠা ১৭-২০।)

'ধন অর্জন ও রক্ষণের জন্য, নিজের সন্মান রক্ষণও বর্দ্ধনের জন্য, স্বজাতির সন্মান রক্ষণ ও বর্দ্ধন, ধর্মের উন্নতির জন্য শিক্ষার আবশ্যক'। এইভাবে তিনি জনগোষ্ঠীকে বার বার উদ্বুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছেন। শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা প্রকৃত শিক্ষা তাই তিনি বলেছেন--

'হামরা হামরা হম

নাক ফোড়া বলদ.....হমো না।'

তাই বলি ভাই সব ! বন্ধুসব ! আপনাদের নিকট করজোরে শত শত বার বিনীতভাবে বলিতেছি আপন, আপন সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবেন। তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার্থে যদি সর্ব্বস্ব নিঃশেষিত হয়, যদি ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাতে হয় তাহাও করিবেন, তথাপি তাহাদের মুর্খ করিয়া রাখিবেন না।'' (রায় সাহেব পঞ্চানন - পৃঃ ৫১-৫২)

তিনি আরো বলেছেন - অনেকের এরূপ কুধারনা আছে যে নিজের বিষয় আশয় ধন সম্পত্তি থাকিলেই পুত্রাদির লেখাপড়া শিক্ষা বিষয়ে বড় একটা মনোযোগী না হইলেও চলে। তাহারা মনে করেন যে আমাদের যে ধন সম্পত্তি আছে তাহাই চালাইয়া ফিরাইয়া খাইলে তাহারা সুখে সাচ্ছন্দে জীবন নির্বাহ করিতে পারিবে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য বৃথা অর্থব্যয় করিতে যাইয়া সামান্য কিছু বিদ্যালাভ করিলেই চলিবে। অধিক বিদ্যার কাজ কি ? আমার ছেলে কোথায় চাকুরী করিতে যাইবে ? ইত্যাদি কুপ্রভাব, কুধারনা মনে স্থান দিয়া কেহ বা পুত্র দিগকে অধিকতর স্নেহ করিয়া একেবারে মুর্খ করিয়া রাখেন। চাকুরী করিবার জন্যই যে বিদ্যাশিক্ষা করিবার প্রয়োজন তাহা কেহ মনে করিবেন না। বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষাই জাতির মূল ভিত্তি স্বরূপ। বিদ্যার গুনে দেবত্ব প্রাপ্ত হয় আর বিদ্যাশিক্ষার অভাবে লোক পশুতে পরিণত হইয়া নানা প্রকার কুকার্যে আসক্ত হইয়া পড়ে। বিদ্যান ব্যক্তিদের পৈত্রিক স্থাপিত ধন সম্পত্তি না থাকিলেও তিনি নিজ বিদ্যা ও জ্ঞান বলে তাহারা সহজে ধন সম্পত্তি উপার্জন বা সঞ্চয় করিতে পারে। আর অশিক্ষিত মুর্খ ব্যক্তি পিতার অর্জিত ও অপর্যাপ্ত ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াও কেবল মাত্র মুর্খতার দোষে পৈত্রিক সম্পত্তি একেবারে ছারখার করিয়া ফেলে। তাই বলি ভাইসব ! বন্ধুসব ! আপনাদের সকলের নিকট করজোড়ে শতশতবার বিনীত ভাবে বলিতেছি, আপন আপন সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবেন। ।ক্ষত্রিয় সমিতির অষ্টম বার্ষিক (১৩২৪) কার্যবিবরণী। শিক্ষার প্রতি রায় সাহেবের যে গভীর অনুরাগ ছিল তার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। সমাজ সংস্কারে তিনি ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ, তাঁর কর্তব্য জ্ঞান ছিল তুলনাহীন। সামান্য একটা কাজেও তিনি তৎপর হয়ে উঠতেন। রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার জীবনীকার উপেন্দ্র নাথ বর্মন এক জায়গায় লিখেছেন--''পঞ্চানন বর্মা সবে খেতে বসেছেন এমন সময় এক গরীব ছেলে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান যে, সে পরীক্ষার ফী জোগাড় করতে না পারায় পরীক্ষা দিতে পারবে না। তিনি যদি কলেজের প্রিন্সিপালকে বলে ফীটা মুকুব করে দিতে পারেন তবেই পরীক্ষায় বসতে পারবে। ছেলেটির কথা শুনে তিনি তখনই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রিন্সিপাল মহোদয়ের কাছে গেলেন এবং ফী মুকুবের ব্যবস্থা করলেন। প্রিন্সিপাল মহোদয় এতে খুব লজ্জিত হয়ে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মাকে বলেছিলেন - 'এই সামান্য ব্যাপারে আপনি কষ্ট করে এলেন কেন ? আমাকে ডেকে নিয়ে তো বলতে পারতেন।' যাই হোক সামান্য কাজ করে এসে পড়ে খেলেন, খেতে খেতে বললেন,

'দেখলে তো খাওয়াটা কত শান্তিতে খাওয়া যাবে'। তাঁর মত আদর্শবান পুরুষ খুব কমই ছিল। ছোট বড় যে কোন কাজকে তিনি সমান মর্যাদা দিতেন।

কোচবিহার রাজ্যের মেখলিগঞ্জ মহকুমার অর্ন্তগত কুচলিবাড়ি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। শ্রীযুক্ত রায় বি.এস.সি পাশ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল আরও শিক্ষা লাভের প্রতি। কিন্তু বাবার অবস্থা ভাল নয় জেনে তা সম্ভব ছিল না। রংপুরে রায় সাহেবের গোচরে আসায় তিনি উদগ্রীব হয়ে ওঠেন যোগেশ বাবুকে অর্থের সংস্থান করে আরো উচ্চশিক্ষিত করা। রায় সাহেব বিশ্বাস করতেন যে যোগেশকে উচ্চশিক্ষায় সাহায্য করলে সমাজ তার সুফল লাভ করবে। তাই যোগেশের উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক সংস্থান করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। যোগেশের ইচ্ছা বিলেতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পরা। যোগেশের ইচ্ছা পূরণের জন্য রায় সাহেব সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে আর্থিক সমস্যার সুরাহা করে দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি সমিতির সভায় আলোচনা করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল তার কিছু অংশ লিপিবদ্ধ করছি --বিলাতে শিক্ষার্থ মাসিক খরচ ১২৫ টাকার নূন্য নহে। তন্মধ্যে তিনি কলিকাতা বিজ্ঞান সমিতি হইতে মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি কুচবিহার মহারাজের দুয়ার অফিস হইতে পাইতেন। ১৫ টাকা বাড়াইয়া ৫০ টাকা করার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। বাকী ৫০ টাকা মাসিক সাহায্য সমিতির ধন ভাণ্ডার হইতে দিতে স্বীকার করা হইয়াছে। বিলাত যাওয়ার জন্য তাহার অনেক অনটন হইয়া পড়ে। কুচবিহারের বৃত্তি বাড়িবার আশা ছিল ; তাহারও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বন্ধুহীন বিদেশে কাহারই বা সাহায্য পাইবে ? সাহায্য না করিলে তাহার মহা বিপদ হইবে ইত্যাদি ভাবিয়া তাহাকে স্বীকৃত মাসিক চান্দা কতক পরিমাণে অগ্রিম দিতে হইয়াছে। উপরোক্ত বিবরণ থেকেই বোঝা যায় যে রায় সাহেব কতটা শিক্ষা দরদী ছিলেন। একজন দুঃস্থ ছাত্রকে উচ্চশিক্ষায় অর্থিক সাহায্য করতে পেরে তিনি নিজেও খুব আনন্দিত হয়েছিলেন।

শিক্ষার প্রতি রায় সাহেবের যে গভির অনুরাগ ছিল তা ক্ষত্রিয় সমিতির কার্য বিবরণীর বহু পাতায় উল্লিখিত আছে। ক্ষত্রিয় সমিতির পঞ্চম বার্ষিক সন্মীলনীর কার্য বিবরণীতে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের কৃতি দানের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই কার্য বিবরণীর পঞ্চদশ প্রস্তাবে গরীব ছাত্রদের সাহায্যে এই শিরোনামে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা বর্তমানেও অতি প্রাসঙ্গিক। কার্য বিবরণীতে বলা হয়েছে যে --

'শিক্ষার উন্নতির বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য দুঃস্থ, উৎকর্ষ সম্পন্ন, গভর্ণমেন্ট হইতে অপ্রাপ্ত সাহায্য মেট্রিকুলেশন বা তদুর্ধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে অসংকুলান পূরণ করিবার জন্য বার্ষিক ৫ টাকা ও ৭ টাকা হারে সাহায্য দেওয়ার নিয়ম হউক।' এই বৃত্তি প্রদানের প্রস্তাবক ছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতির অপর এক অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত লক্ষীনারায়ণ বর্মা, কবি ভূষণ, কাকিনা, রংপুর। প্রস্তাব করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন যে, 'শিক্ষা শব্দের অর্থ আমরা অনেক সময় না বুঝিয়া

নিতান্ত সংকোচ করিয়া ফেলি, এবং এই সংকুচিত অর্থ, অর্থাৎ স্কুল কলেজে লেখাপড়া অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষা শিক্ষাই নহে। আরো শিক্ষা আছে। সামাজিক শিক্ষা, লোকসংস্কৃতি শিক্ষা, নীতি শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষা, মনুষত্বের প্রকৃত বিকাশ করিয়া ক্রমশঃ দেবত্ব আনিয়া দেয়। লেখাপড়া শিক্ষা উন্নতির একটি সোপান। সুতরাং লেখাপড়া শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য উৎসাহ দিতে হইবে। বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রস্তাব পাঠ শেষ মাত্রই শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ সিংহ, ডিমলা, রংপুর, তা সমর্থন করেন। সভায় প্রস্তাবের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং শিক্ষার প্রয়োজনে সর্বসন্মতিক্রমে প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি কার্যকর করতে এবং গরীব উৎকর্ষ সম্পন্ন ছাত্ররা যাতে বৃত্তিলাভে সমর্থ হয় সেজন্য রায় সাহেব এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমন কি ক্ষত্রিয় সমিতির ধনভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমান অর্থ না থাকা সত্বেও নির্দ্দিষ্ট কিছু টাকা লেখাপরা শিখিবার জন্য ব্যয় করার বন্দোবস্ত করেন। রায় সাহেব পঞ্চানন ব্যক্তিগত জীবনেও নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে শিক্ষালাভ করেছিলেন। ঐ যুগে মাথাভাঙ্গা মহকুমার প্রত্যন্তে উচ্চশিক্ষা লাভে তাঁর সাফল্য ছিল এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। রায় সাহেবের নিজের শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও আগ্রহ থাকায় যখনই কোন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রের আর্থীক বা অন্য কোন প্রকার সমস্যার কথা জানতে পারতেন তখনই তার পাশে দাড়িয়ে তার শিক্ষালাভের সুবন্দোবস্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

রাজবংশী সমাজের ছাত্রদের শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং উৎসাহ দেবার জন্য দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতির তহবিল থেকে।

কয়েকটি নামের তালিকা --

১। ব্রহ্ম নারায়ণ রায়, **২। নগেন্দ্র নারায়ণ রায়,**
৩। নগেন্দ্র নাথ রায়, **৪। ভীমচন্দ্র বর্মা,**
৫। গিরীশ চন্দ্র রায়, **৬। বলধর রায়,**
৭। কৃষ্ণ কুমার বর্মা, **৮। ধ্রুবপদ রায়,**
৯। শ্যামাপদ বর্মা, **১০। মনসা রায় বর্মা,**
১১। কৃষ্ণহরি বর্মা, **১২। আনন্দ মোহন রায়,**
১৩। গোবিন্দ প্রসাদ বর্মা, **১৪। জাহ্নবী কান্ত সিংহ,**
১৫। সতীশ চন্দ্র সরকার, **১৬। ভোলানাথ রায়,**
১৭। যোগেশ চন্দ্র রায়, **১৮। গঙ্গা মোহন বর্মা,**
১৯। নীলকান্ত বর্মন, **২০। সারদা প্রসাদ বর্মা,**
২১। প্রফুল্ল কুমার বর্মা, **২২। সদানন্দ বর্মা,**
২৩। শ্যামা প্রসাদ রায়, **২৪। মনসা রাম সিংহ,**

২৫। হরচন্দ্র বর্মা, **২৬। ভূমিধর রায়,**
২৭। পতিরাম সিংহ, **২৮। সতীশ চন্দ্র রায়,**
২৯। হরচন্দ্র বর্মন, **৩০। রজনী কান্ত বর্মা,**
৩১। উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, **৩২। তারক চন্দ্র রায়,**
৩৩। রমনী মোহন বর্মা, **৩৪। সুরেশ চন্দ্র রায়,**
৩৫। দীনেশ চন্দ্র বর্মা, **৩৬। ভূমিধর বর্মা প্রধান,**
৩৭। রমেশ চন্দ্র বর্মা, **৩৮। প্রসন্ন কুমার সিংহ,**
৩৯। উমেশ চন্দ্র রায়, **৪০। মদন মোহন বর্মা,**
৪১। রাজ চন্দ্র বর্মা, **৪২। আন্না মোহন রায়।**

(বৃত্ত বিবরণী ১৩২৪ সাল ৮-১০-১১, ১৩২৬ সাল ২২৩-২৩ এবং ৩১-৩২ পৃঃ)

রায় সাহেব আরো বলেছেন, 'ভাই সামাজিকগণ ইহাদিগের প্রতি (ছাত্রদের) আপনাদিগকে দৃষ্টি করিতে হইবে। দরিদ্র ছাত্রের অভিভাবকগণ সাধ্যমত যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন, অতিরিক্ত আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠের সাহায্য করত সমাজের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করুণ। একবিংশ শতাব্দী আর উনবিংশ শতাব্দীর অবস্থা এক নয়। বর্তমানে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের পুস্তক, অর্থ সংগ্রহ, বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি বহু উদ্যোগ নিয়ে থাকে কিন্তু ঐ যুগে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন অবিভক্ত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল অতি নগন্য এবং শিক্ষানুরাগী মানুষ হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। তখন রায় সাহেবের এ জাতীয় প্রয়াস বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হওয়া আমাদের বিস্ময়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো জ্বালাবার চেষ্টা করেছিলেন কলকাতাকে কেন্দ্র করে। তাদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার , বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অতি সাধারণ ঘরের সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য একক প্রচেষ্টা চালিয়ে সমাজের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। প্রাথমিক ভাবে দুঃস্থ ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান, ছাত্রাবাস নির্মান করা এবং সমিতির ধনভান্ডার থেকে অর্থ সাহায্য করা হয়েছিল-কিন্তু কতটুকু ? এতে তিনি নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। শিক্ষার জন্য তাঁর অদম্য উৎসাহ বা অতৃপ্ত আকাঙ্খা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন। শিক্ষার উদ্দ্যেশে বলতেন, 'ভাই ইহাতে আমাদের শিক্ষা বিষয়ক কার্য পর্যাপ্ত নহে। শিক্ষা বিষয়ে আমাদের উদ্যম আরো বৃদ্ধি করিতে হইবে। স্থানে স্থানে পাঠশালা নির্মান স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রায় সাহেবের আবেদনে সারা দিয়ে ২/১ টি বিদ্যালয় স্থাপন করতে দেখা যায়। যেমন ডিমলা থানার অর্ন্তগত নাউতারা (ঢেপার) ক্ষত্রিয়গণ সকলে মিলে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। সম্পাদক মহিম চন্দ্র বর্মন, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রট মহিম চন্দ্র বাবুর পরিশ্রমে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল, স্কুল সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস তৈরীর চেষ্টা চলতে ছিল। এতে নাউতারা বাসীদ্বারা সমাজ উপকৃত হয়েছিল। ১৩২০ সালে চোর তারা বাড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন বর্মা মহাশয়ের উৎসাহ সমাজে সুবিদিত। তিনি জাতীয়

উন্নতির জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিয়া আলোচ্য বর্ষে চোতরাবাড়ি নিবাসী শ্রযুক্ত হরিমোহন বর্মা নিজেই সমস্ত বহন করে স্কুল ঘর নির্মান করেন -অন্যেরা সাহায্য করেন নাই। তাঁর স্বার্থত্যাগ অবশ্যই উৎসাহজনক। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার অর্ন্তগত ফুলবাড়ি গ্রামে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ১৩১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্থানীয় পদ্মনাথ বর্মা হেডমাস্টার ছিলেন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যু বিদ্যালয়টির ক্ষতি হয়। স্কুল সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস নির্মান করা হয়েছিল। স্বজাতির উন্নতির জন্য শ্রীযুক্ত কান্ত নারায়ণ সিংহ মহাশয় বিদ্যালয়টির জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া একটি ছাত্রাবাস নিজ ব্যয়ে নিজ বাড়িতে তৈরী করে দিয়েছিলেন। (বৃত্ত বিবরণী ১৩২০ সাল।) বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তরবঙ্গ শিক্ষা ও প্রসারের জন্য রায় সাহেব যে নিরলস প্রয়াস করেন, তারই ফসল হিসেবে এতদঅঞ্চলে এক বিদ্যুৎ সমাজ গড় ওঠা সম্ভব হয়েছে।

কর্মজীবনে রায় সাহেব ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্ব। সারা জীবনই তাকে নানা প্রতিকুলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার কর্ম নিষ্ঠা ও সাহস এবং যে কোন মহৎ কার্যে তাঁর উদ্যম ছিল এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ক্ষত্রিয় জাতির মর্যাদা রক্ষা করা, নানা সামাজিক সংস্কার, ধর্মীয় সংস্কার, ভূমি সংস্কার নারী জাতিকে মর্যাদা দান ইত্যাদি কর্মের জন্য তিনি বাংলা তথা উত্তর পূর্বভারতের এক বরেণ্য সন্তান হিসেবে খ্যাত। এর বাইরেও প্রথম একজন মেধাবী ছাত্র ও পরবর্তী সময়ে একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবক হিসেবে তাঁর অবদান চিরস্মরনীয়। কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং শিক্ষা প্রসারের জন্য আজীবনে তিনি যে সংগ্রাম করে গেছেন সে কথা চিন্তা করলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। কিন্তু পঞ্চানন বর্মার জীবন ও সাধনা সবই এক প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যালয়ে প্রবেশ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সময়ে তাকে লড়াই করতে হয়েছে। এ লড়াই কখনও বহিঃ সমাজের সঙ্গে কখনও অন্তঃ সমাজের সঙ্গে। লড়াই তাকে ছাড়েনি কখনো। কিন্তু যে সব কারণের জন্য তিনি আমৃত্যু লড়াই চালিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর সব পথগুলি হারিয়ে ফেলেছে। এ এক অদ্ভূত অবস্থা। অনেকটা গৌতম বুদ্ধের মতন। গৌতম বুদ্ধ যা যা চান নি বা পছন্দ করতেন না তার শিষ্যরা তাই করেছেন। যেমন বুদ্ধমূর্তি গড়েছেন। বুদ্ধদেব এর বিরোধী ছিলেন। পঞ্চাননের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। যেমন জীবিত অবস্থায় তাঁকে ঠাকুর পঞ্চানন বা রায় সাহেব পঞ্চানন বলে অখ্যায়িত করেছেন। এতেই মানুষ অভ্যস্ত ছিলেন। অনেক পরে তাকে মনীষী পঞ্চানন বলে আখ্যায়িত করা হলো। এই আখ্যায়ন অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জনমানসে তিনি ঠাকুর পঞ্চাননই রয়ে গেছেন। এর মূল্যায়ন এখনও করতে পারি নি। তবে করাটাও প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে। (আনন্দ গোপাল ঘোষ)

পরিশেষে বলতে হয়, রায় সাহেব বিশ শতকে যে কর্মকান্ড শুরু করেছিলেন এবং ক্ষত্রিয় সমাজের বুকে যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন তার পরিধি ছিল বিশাল --

কিন্তু দুর্ভাগ্য পঞ্চাননের মৃত্যু এবং দেশ বিভাজনের ফলে তাঁর যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাই আবেদন করব বুদ্ধিজীবিদের কাছে দেড়শত বছরে যেন তিনি হারিয়ে না যান রাজবংশী সমাজের হৃদয় থেকে। বরং আশা করব বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় এগিয়ে এসে আবার নতুন ভাবে নুতন রূপে রূপ দেবার চেষ্টা করতে হবে।